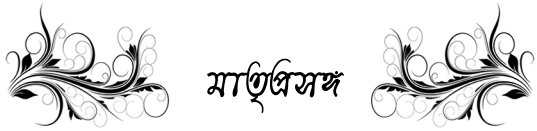

মাতৃপ্রসঙ্গ

এহ্যেহি ভগবত্যম্ব

তারাপদ ভট্টাচার্য

মা বিশ্বজননী, তোমায় প্রণাম। তোমার দশ হাতের দশ প্রহরণকে প্রণাম। তোমার লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশকে প্রণাম। প্রণাম করি তোমার বাহনটিকে। প্রণাম করি সেই মহাবলী কৃষ্ণ মূর্তিটিকে, যাঁর বুকে তুমি ত্রিশূল বসিয়ে অনুদ্ধত রেখেছ। তিনি যদি অনুপস্থিত থাকতেন বিশ্বে, কাকে বধ করে তুমি ঋষিকণ্ঠ ধ্বনিত করতে—'অসুরাসৃগ্‌বসাপঙ্কচর্চিতস্তে করোজ্জ্বলঃ/ শুভায় খড়্গো ভবতু'—তোমার দীপ্ত করে রক্তসজ্জার পঙ্কে চর্চিত খড়্গ আমাদের শুভ করুক?

মা, তোমায় আজ ডাকব কী! জন্ম থেকেই তো 'দুর্গা দুর্গা' করছি। অল্প অল্প মনে আসে—সেই বছর তিনেক বয়সে গর্ভধারিণী জননী বিছানায় বসে ডাকতেন, ''বাবা, দুর্গা দুর্গা করো।" টুকরো টুকরো করে আবৃত্তি করাতেন—''প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গা-দুর্গাক্ষরদ্বয়ম্।/ আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্যোদয়ে যথা॥"—'দুর্গা, দুর্গা' এই দুটি অক্ষর যে প্রভাতবেলায় নিত্য স্মরণ করবে, তার সব আপদ নষ্ট হয়ে যায়, সূর্যোদয়ে অন্ধকার যেমন কাটে।

বড় হয়ে দেখি বিপুল তোমার মহিমা। ধ্যানী পুরুষ বলছেন : ''চক্রং চক্রী শূলমাদায় শূলী/ বজ্রং বজ্রী পাশমাদায় পাশী।/ ধাবন্ত্যগ্রে পার্শ্বয়োঃ পৃষ্ঠতশ্চ/ দুর্গাদুর্গাবাদিনো রক্ষণায়॥"—'দুর্গা দুর্গা' বলে যিনি যাত্রা করেন, তাঁর চলতি পথে তাঁকে রক্ষার জন্য তাঁর আগে আগে ডাইনে বাঁয়ে এবং পিছন দিকে, যথাক্রমে চক্র নিয়ে বিষ্ণু, ত্রিশূল নিয়ে শিব, বজ্র নিয়ে ইন্দ্র এবং বন্ধনরজ্জু নিয়ে বরুণ দৌড়ে চলেন।

এই বিপুল শক্তিধর দেববৃন্দকে তুমি অনুকূলিত করেছ তোমার সুতমঙ্গলের জন্য। তোমার মহিমা উপলব্ধি করি তোমার পূজার সার্বজনীন ভাব দেখে। তুমি আপামর জনসঙ্ঘের। শাস্ত্র বলছেন : ''ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈঃ শূদ্রৈরন্যৈশ্চ সেবকৈঃ।/ এবং নানাম্লেচ্ছগণৈঃ পূজ্যন্তে সর্বদস্যুভিঃ॥"—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, অন্য সেবককুল এবং নানান জাতীয় ম্লেচ্ছগণ এমনকী সব রকমের দস্যুরাও তোমার পূজা করেন। সবার মন সমান নয়। কেউ সাত্ত্বিক, কেউ বা রাজসিক, কেউ বা তামসিক প্রকৃতির। তাঁদের সাধনবিধিও রকম রকম। 'সাত্ত্বিকী জপ-যজ্ঞাদ্যৈর্নৈবেদ্যৈশ্চ নিরামিষৈঃ'—তোমার পূজার সাত্ত্বিক পথে জপ, যজ্ঞ প্রভৃতি হবে, নৈবেদ্য হবে নিরামিষ। 'রাজসী বলিদানেন'—রাজসিক পূজা হবে বলিদানের দ্বারা। মন্ত্রতন্ত্র জানে না যারা, তাদের নিবেদনও গ্রহণ কর তুমি। দিব্যদর্শী

শাস্ত্রকার বলেছেন : ''সুরামাংসাদ্যুপহারৈর্জপযজ্ঞৈর্বিনা তু যা।/ বিনা মন্ত্রৈস্তামসী স্যাৎ কিরাতানাং চ সম্মতা॥''—মদ, মাংস উপহার অর্থাৎ নৈবেদ্য হবে, জপ থাকবে না, যজ্ঞ হবে না, মন্ত্রতন্ত্রের প্রয়োগ নেই—এইভাবে ব্যাধরাও তোমার ভজনা করেন। চতুর্বর্ণের অধিকারের গণ্ডিকে অতিক্রম করে বিশ্বমানবকে অধিকার দান করেছ তুমি তোমার পূজার। তোমার স্নানে যেমন গঙ্গার মাটি লাগে, তেমনই দিতে হয় বেশ্যার দুয়ারের মাটি। তুচ্ছ কীটকেও তুমি ধন্য করেছ। তার স্তূপের মাটি দিয়ে তোমার স্নান হয়। কে পবিত্র, কে অপবিত্র? কী শুদ্ধ, কী অশুদ্ধ? তোমার কাছে সব গ্রাহ্য।

তাই বিশ্বধারিণী তুমি মহিষাসুরকে বলেছিলে—বধ করব তোমাকে আমি কিন্তু 'নৈব ত্যক্ষ্যসি মৎপাদম্'—কোনওমতে আমার পা তুমি ছাড়বে না। হে বিশ্বনুতে, তাই মহিষাসুরের বাম কাঁধে তোমার বাম চরণের অঙ্গুষ্ঠটি বিরাজ করছে। তুমি দৃষ্টান্ত দিয়ে উদ্‌বোধিত করেছ আমাদের—''পাপকে বিনষ্ট করো, পাপীকে নিরাশ্রয় কোরো না।''

মা, তুমি বিশ্বময়ী, তাই প্রকৃতি তোমার বড় প্রিয়। স্থলে, জলে, বনতলে, নভঃস্থলে কী বিচিত্র শোভা আজ! কলাগাছে তুমি ব্রহ্মাণীরূপে বিরাজ করছ। আমরা 'রম্ভারূপায়ৈ ব্রহ্মাণ্যৈ নমঃ' বলে তাঁর পূজা করি। কচুগাছে তুমি আছ কালীরূপে। আমরা 'কচ্বধিষ্ঠাত্র্যৈ কালিকায়ৈ নমঃ' বলে তাঁর পূজা করি। হলুদগাছে তোমার অধিষ্ঠান দুর্গারূপে। আমরা 'হরিদ্রাধিষ্ঠাত্র্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ' বলে তাঁর পূজা করি। জয়ন্তীগাছে তোমার কার্তিকীরূপে স্থিতি। আমরা 'জয়ন্ত্যধিষ্ঠাত্র্যৈ কার্তিক্যৈ নমঃ' বলে তাঁর পূজা করি। বেলগাছে তুমি রয়েছ শিবারূপে। আমরা তাতে 'বিল্বাধিষ্ঠাত্র্যৈ শিবায়ৈ নমঃ' মন্ত্রে তোমার পূজা করি। ডালিমগাছে রক্তদন্তিকারূপে তুমি আছ। ওই গাছে আমরা 'দাড়িম্যধিষ্ঠাত্র্যৈ রক্তদন্তিকায়ৈ নমঃ' বলে তোমায় নৈবেদ্য দিই। অশোকগাছে শোকরহিতারূপে রয়েছ তুমি। 'অশোকাধিষ্ঠাত্র্যৈ শোকরহিতায়ৈ নমঃ' মন্ত্রে তোমার পূজা হয় তাতে। মানগাছে চামুণ্ডারূপে তোমার বাস। আমরা 'মানাধিষ্ঠাত্র্যৈ চামুণ্ডায়ৈ নমঃ' বলে সেখানে তোমার আরাধনা করি। ধানগাছে লক্ষ্মীরূপে তোমার সত্তা। 'ধান্যাধিষ্ঠাত্র্যৈ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ' মন্ত্রে সেখানে তোমার পূজা হয়। সবশেষে হে জননী, ওই নয়টি গাছকে সাদা অপরাজিতা লতা দিয়ে বেঁধে 'নবপত্রিকাবাসিন্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ' এই মন্ত্রে যথাসম্ভব উপচারে তোমার পূজা করি।

জননী, একটা তারুণ্য উদ্দীপ্ত হয়েছে সমাজজীবনে তোমার আগমন উপলক্ষ্যে। চঞ্চল পটুয়া তোমার মূর্তি গড়ার জন্য সন্ধে-সন্ধে খাওয়া-দাওয়া সেরে, কোথাও কেরোসিনের লম্ফ ধরে, কোথাও বা বিজলিবাতির আলোয় নীরবে গড়ছেন ঋষি-মুনিদের ধ্যানে দৃষ্ট তোমার মূর্তি। মন চলে যাচ্ছে সুদূর অতীতে, কবে তোমার প্রথম পূজা হয়েছিল তার খোঁজে।

সে কোন সুদূর অতীত। ক্ষত্রিয় রাজা সুরথ এবং বৈশ্য সমাধি ছিলেন সুখসম্পদে আপন অধিকারে। সহসা শত্রু এসে ছিনিয়ে নিল রাজার সিংহাসন। আর জ্ঞাতি-কুটুম্বরা কেড়ে নিল সমাধির তামাম সম্পদ। দুই পুরুষ ঘুরতে ঘুরতে এলেন একই বনে। দুঃখের বার্তা বিনিময় হল। ওই বনেই মেধস্ মুনির আশ্রম। ওঁরা দুজনে গেলেন সেখানে। নিবেদন করলেন আপন আপন দুঃখের বার্তা। মুনি বললেন, ''মহামায়ার শরণ নাও।'' 'সা যাচিতা চ বিজ্ঞানং, তুষ্টা ঋদ্ধিং প্রযচ্ছতি'—প্রার্থনা করলে তিনি জ্ঞান এবং সাংসারিক সমৃদ্ধি, দুটোই দান করেন।

অবিলম্বে দুজনে গেলেন নদীর তীরে। সেখানে 'দেব্যাঃ কৃত্বা মূর্তিং মহীময়ীম্'—মাটি দিয়ে দেবীর মূর্তি গড়ে পূজা করলেন তাঁর।

জননী, শাস্ত্র বলছেন 'ত্রিভির্বর্ষৈঃ'—তিন বছরের পূজায় প্রত্যক্ষ হয়েছিলে তুমি তাঁদের

কাছে। দুজনেরই অভাব মিটেছিল। যুক্তকরে তোমায় শুধাই—এই যে বছরের পর বছর চলেছে আমাদের পূজা, দুর্দিন ঘুচে কি সুদিনের অভ্যুদয় ঘটেছে? মণ্ডপ সুন্দর থেকে সুন্দরতর হয়েছে। আলোর কত বিচিত্র সাজ! বাদ্যভাণ্ডের প্রতাপে দিগন্ত মুখর। কিন্তু আমাদের হৃদয়ের তিমির-অবগুণ্ঠন কি ঘুচেছে?

হে জননী, শিউলি তোমার দূতী। সে তার আশ্রয়তরুর বৃন্তে বৃন্তে বিকশিত হয়ে গন্ধভারে রাত্রির তিমির-অবগুণ্ঠনকে মোহময় করেছে। আকাশে বৃষ্টিবিহীন গুরু-গুরু ধ্বনি ক্ষণে ক্ষণে বাতাস মন্দ্রিত করছে। ধানের খেতে ছায়া নামছে, সরছে। তরঙ্গ জেগেছে মাটিতে। কোকিল ছুটি নিয়েছে। দোয়েল শ্যামা প্রকৃতির রূপমঞ্চে ডাকছে মধুর স্বরে। ডালে ডালে ফুল, কত ফল! তোমায় শিতিকণ্ঠকে ছেড়ে আসতে হবে না। আমরা তোমার যে-প্রতিমা গড়ব, তার চালচিত্রের মাথায় মধ্যমণি হয়ে বিরাজ করবেন তিনি।

হে বিশ্বজননী, তোমার পূজার ক্ষণে সিংহপৃষ্ঠে রাখা অলক্তকসিক্ত তোমার দক্ষিণ চরণে ললাট রেখে যা বলব, এই নিমন্ত্রণবার্তায় তা আগাম জানিয়ে রাখি : সকলের মুখে অন্ন উঠুক, সকলকে সৎ হওয়ার শক্তি দাও। সর্ব খর্বতাকে নির্বাসিত করে মানবহৃদয় ভক্তির রসে প্লাবিত হোক।

'এহ্যেহি ভগবত্যম্ব'—হে ভগবতী জননী, তুমি এসো, তুমি এসো।

চিত্রপরিচিতি

হুগলি জেলার আঁটপুর গ্রামে দাসবাড়ির অভয়াদুর্গা মায়ের বাৎসরিক পূজা শতাব্দীপ্রাচীন। পরিবারের প্রাচীন পুরুষ নিবারণ চন্দ্র দাস ছিলেন নিরক্ষর, সামান্য জমিজমার আয় এবং মুহুরির চাকরি সম্বল করে বৃহৎ পরিবার প্রতিপালন করতেন। কালক্রমে অগ্রজ ভ্রাতা হরিহর দাসের সস্নেহ তত্ত্বাবধান ও বুদ্ধিবৃত্তির জোরে তাঁরা পারিবারিক জমিজমার পরিমাণ বর্ধিত করেন এবং নিজস্ব তন্তুবায় ব্যবসার পত্তন করে উন্নতি সাধন করেন। নিবারণচন্দ্র স্বপ্নে দ্বিভুজা অভয়দুর্গা দর্শন করেন। তখন ১৩২০ সাল। ভয়াবহ বন্যায় বাংলা বিধ্বস্ত। নতুন করে জেগে ওঠার আশায় বুক বাঁধছে জনমানস, নতুন করে গড়ে তুলতে চলেছে জনজীবন। ঠিক এমনি দৃঢ় সংকল্পের মাঝেই উদ্ভাসিত হয়েছিল মায়ের স্বপ্নপ্রতিমা, মূর্তি গড়ে শুরু হয়েছিল আরাধনা।

আগে মহালয়া তিথি থেকেই চণ্ডীপাঠের রীতি ছিল, বর্তমানে মহাষষ্ঠী তিথিতে মায়ের বোধন বসে এবং চণ্ডীপাঠ শুরু হয়। পূজায় মহানবমী তিথিতে ছাগবলি চালু ছিল। পরবর্তী কালে সেই প্রথা বন্ধ হয়ে সাদা কুমড়ো বলি দেওয়ার প্রথার প্রচলন হয়েছে। প্রতিমা গড়া, মায়ের মুখশুদ্ধির উপকরণ দেওয়া, মাটির বাসন সরবরাহ, ফুল তোলা, বাসন মাজা, বলিদানের কামারের কাজ, এমনকী ঠাকুর দালান ও গৃহ সংলগ্ন অঞ্চল পরিষ্কার করার কাজটিও সুচারুরূপে স্থানীয় মানুষেরাই করে থাকে প্রাচীন প্রথা ও পরম্পরা মেনে।

মহালয়ার পর তৃতীয়া বা চতুর্থী তিথিতে মাতৃপূজার গঙ্গাজল আসে শেওড়াফুলি ঘাট থেকে। নবমীতিথিতে হয় কুমারীপূজা। দশমীর সন্ধ্যায় মাকে বরণ এবং সিঁদুরখেলার পর দেবী যাত্রা করেন পাড়া বেড়াতে। পাড়া বেড়িয়ে দেবীপ্রতিমা বিসর্জিতা হন মিত্তিরদের বড় পুকুরে।

বহু বিপদ সত্ত্বেও দাস পরিবারের বার্ষিক মাতৃ-আরাধনায় ছেদ পড়েনি। প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারা বহন করে এবং পরম্পরা মেনে আজও পরিবারের সদস্যেরা দেবী-আরাধনার ধারাকে যথাযোগ্য সম্মানে বহন করে চলেছেন।

সৌজন্য : ঝরনা ভট্টাচার্য